Vol. 49 | No. 3 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জাতীয়তা, মুক্তিযুদ্ধ ও রবীন্দ্রসংগীত

Volume	49
Issue	3
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sayeem Rana
Published online	June 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i3(2).12
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i3(2).12
Pages	135-146
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

জাতীয়তা, মুক্তিযুদ্ধ ও রবীন্দ্রসংগীত

Check for updates

সাইম রানা*

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জনে দেশাত্মবোধক গান ছিল প্রেরণার উৎসস্বরূপ। বিশেষত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মুক্তিকামী মানুষের জন্য যে ধৈর্য ও সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল, অস্তিত্বের প্রশ্নে সেই চরম বিপর্যয়-মুহূর্তে বিচিত্র ধারার বাংলা গান স্বাধীনতাকামী জনগণকে উৎসাহ ও শক্তির জোগান দিয়েছিল। এর মধ্যে ছিল দেশাত্মবোধক গান, গণসংগীত, জাতীয় সংগীত, প্রতিবাদধর্মী লোকসংগীত, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে রচিত আধুনিক গান ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানও ছিল এই সময়ের অন্যতম প্রেরণা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রায় আশি বছর আগে ১৮৬৭ সালে 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরে বাংলায় জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ ও স্বদেশচেতনা সূচিত হয়। হিন্দুমেলার অন্যতম নীতিনির্ধারক রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) ওই বছরের ১২ এপ্রিল কলকাতা বেলগাছিয়ার ডানকিন সাহেবের উদ্যানে হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশনে 'শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভা'র এক বক্তৃতায় সংগীত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেন। সংগীত শিক্ষার্থীদের 'অন্তঃকরণে দেশহিতৈষিতা ও সময়ানুরাগের সঞ্চার হইতে পারে'—এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংগীত বিদ্যালয় স্থাপনের আহবান জানান[১]। হিন্দুমেলাকে উপলক্ষ করে প্রথম স্বদেশী গানের প্রসার হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতো ভাই গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-১৮৬৯) হিন্দুমেলার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর লেখা 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে' গানটি মেলার প্রথম অধিবেশনে পরিবেশিত হয়। গণেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) হিন্দুমেলার হাল ধরেন। এঁদের কাছ থেকে শুরু হয় দেশাত্মবোধক গান রচনার পালা। মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের রচিত গানে স্বদেশ, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম প্রভৃতি ঝংকৃত হয়ে ওঠে।

সেই সঞ্জীবনী প্রেরণার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র ষোলো বছর বয়সেই (১৮৭৭) রচনা করেন স্বদেশী গান :

তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ।
তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান॥

---

* খণ্ডকালীন প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরের বছর (১৮৭৮) সতেরো বছর বয়সে তিনি রচনা করলেন :

ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যতদিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি তত দিন তুই কাঁদ্ রে।

আঠারো বছর বয়সে তাঁর লেখা আরেকটি স্বদেশী গান :

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
বন্দে মাতরম॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৮ সালে এই গানসমূহ 'জাতীয় সংগীত' সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকো॥'। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের কালে রচনা করেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'; 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—'; 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি'; 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে'; 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—'; 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।'; 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।' ইত্যাদি গান।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ও ভারত ভূখণ্ডের স্বাধীনতা লাভের প্রেক্ষাপটেও রবীন্দ্রনাথের গান ছিল প্রেরণার অন্যতম অবলম্বন। স্বাধীনতা লাভের পর সেই সংগীতই দ্বিজাতিতত্ত্বের ফাঁদে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থি রাজনীতির প্রসারে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী শিল্পচিন্তাকে মানবমুক্তির অন্তরায় বলে বিবেচনা করা হলো কোনো কোনো মহলে, এবং রবীন্দ্রবিরোধী প্রচারণা চলতে থাকল। অবশ্য শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর প্রত্যক্ষ ভূমিকায় ধীরে ধীরে রবীন্দ্রবিরোধী বিতর্ক শান্ত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মকে মূলধারার শিক্ষায় উপস্থাপিত করায় একচ্ছত্র প্রসার ঘটতে থাকে, এবং গবেষণা তৎপরতার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মের বৈচিত্র্য উদঘাটনে ও অনুধাবনে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি জীবন একাত্ম হয়ে ওঠে।

এদিকে পূর্ববঙ্গে (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান) জাতি গঠনের ভিন্ন-প্রকরণে বিশেষ মহল রবীন্দ্রনাথকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রচার করতে থাকল। যেমন ১৯৪৩ সালে 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র বার্ষিক সম্মেলনে সংসদের সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেছিলেন :

> আইরিশ সাহিত্য-আন্দোলনের মতো বাংলা ভাষায় মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র ধারা প্রবর্তন করতে হবে। [মুরশিদ ১৯৮১ : ১৬০]

সেই সম্মেলনের সভাপতি আবুল কালাম শামসুদ্দীন আরেকটু স্বাতন্ত্র্যধর্মী বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন :

> বাংলা সাহিত্যে একটি স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলিম ধারা পত্তনই যথেষ্ট নয়। ...বাংলা ভাষার বর্ণমালায়ও একটা মুসলিম স্বাতন্ত্র্য আমদানী করতে হবে। [মুরশিদ ১৯৮১ : ১৬০]

অর্থাৎ তাঁরা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের থেকে পৃথক এবং মুসলমানদের জীবনভিত্তিক আরবি-উর্দু-ফারসি ভাষার সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের সাহিত্যসংস্কার করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ধর্মই তাঁদের কাছে সাহিত্যের 'মুখ্য নিয়ামক' হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। সেই বিবেচনায় বাঙালির সংস্কৃতি সংগ্রাম গ্রহণ-বর্জনের রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ মুখ্য প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পক্ষে-বিপক্ষে, গ্রহণ-বর্জনে, সম্মেলন-আন্দোলনের যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা প্রধানত ৪টি পর্যায়ে বিবেচ্য হতে পারে :

১. পাকিস্তানপন্থিদের দৃষ্টিতে বিজাতীয় রবীন্দ্রনাথ,
২. জন্মশতবার্ষিকী পালন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন,
৩. সরকারি পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধকরণ এবং
৪. মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রসংগীতের অবদান।

আগেই বলা হয়েছে যে, পূর্ববঙ্গে কোনো কোনো মহলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সৃষ্টিকর্মের দিকে না তাকিয়ে মূলত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উপর ভিত্তি করেই বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ১৯৫১ সালের সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধে তার প্রমাণ পাওয়া যায় :

> মনে রাখতে হবে যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল স্বাতন্ত্র্যবোধের উপর ভিত্তি করে। ...নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজব। সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তোবা জাতীয় সংহতির জন্যে যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। [আহসান ১৯৫১ : ৫৩-৫৪]

বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকের মধ্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হুসেন প্রমুখ এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশ্নে 'রবীন্দ্রনাথকে অপরিহার্য' বলে দাবি করেন এবং রবীন্দ্রনাথ যে মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন না, পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ বাঙালি তাই বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন। সেই সঙ্গে সাহিত্য ও দর্শনের নানা দিক উন্মোচন করেন। যেমন :

> মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'উর্বশী' কবিতার বিশ্লেষণে সুফি প্রভাব আবিষ্কার করেন [আনিসুজ্জামান ১৯৬৮ : ১৬০]। আবুল ফজল রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলেন—'আসলে তিনি হিন্দু অথবা মুসলমান কিছুই ছিলেন না,—তাঁর বিশ্বাস ছিলো উদার মানবধর্মে।'

সার্বিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, পূর্ব-পাকিস্তানে দুই দশক পর্যন্ত রবীন্দ্র-চর্চার ইতিহাস ছিল দ্বিধাবিভক্ত। একদল ধর্মান্ধ ভারতবিদ্বেষী রবীন্দ্র-অনুশীলন বা চর্চা থেকে দূরে থাকে, অন্যদিকে প্রগতিশীল সাহিত্যামোদী মহল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি নিয়ে চর্চা করতে থাকেন।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

১৯৬১ সালে সারা বিশ্বের সংস্কৃতিসেবী মানুষ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে রত হয়। পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতিপ্রাণ মানুষও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে থেমে থাকে নি। পাকিস্তানি

সামরিক সরকারপন্থি-ভারতবিরোধী-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর চক্রান্ত এবং সরকারিভাবে রবীন্দ্রনাথকে বিজাতীয় ঘোষণা দেওয়া সংস্কৃতিসেবীদের জন্য অপমানের কারণ হয়ে ওঠে। তখন তাঁরা নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে ব্যাপক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হাতে নেয়। অন্যদিকে সরকারপক্ষীয় পাকিস্তানপন্থি বুদ্ধিজীবীদের ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়ন তথা পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান মিলিয়ে মুসলিম জাতি হিসেবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে নীতিগত শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয় :

> সোজা কথায়, রবীন্দ্রনাথের দোহাই তুলিয়া অখণ্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামুদ্দুনিক জীবনের বিপদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না। একদল লোক পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের অন্ধ-অনুসারী ও ভক্ত। তাদের রবীন্দ্রভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে এবং বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করে নাই, তারা এই সুযোগে তামুদ্দুনিক অনুপ্রবেশের খেলায় নামিতে পারে। [আজাদ ১৩৬৮ : সম্পা.]

তৎকালে দৈনিক আজাদে প্রায় একমাসব্যাপী ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রবিরোধী ২৬টি প্রবন্ধ, বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। ১২ বৈশাখে 'রবীন্দ্র ও পূর্বপাকিস্তান' সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'রবীন্দ্রবার্ষিকীর অনুষ্ঠান মুসলমানদের কাছে 'কোহেনেদার' ডাকের সমতুল্য এবং এটাকে সাড়া দিলে নিশ্চিত মৃত্যু'। রবীন্দ্রবার্ষিকীর আগের দিন অর্থাৎ ২৪শে বৈশাখ ঢাকা জেলা কাউন্সিল হলে এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন ফজলুল হক সেলবর্ষী, আলোচনা করেন কবি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, দেওয়ান আবদুল হামিদ, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, গোলাম আযম, মাওলানা মহিউদ্দিন হাফেজ হাবিবুর রহমান, আবদুল মান্নান তালিব ও সঞ্জয় বড়ুয়া। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিরোধী হিসেবে ঘোষণা দেন :

> পাকিস্তানে ইসলামভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে অখণ্ড ভারত ও রামরাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসাবে চালু করার জন্য এক শ্রেণীর তথাকথিত সংস্কৃতিসেবী প্রদেশব্যাপী যে সাংস্কৃতিক অপচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, এই সভা তাহাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে। [আজাদ ১৯৬১ : ৮ মে সম্পা.]

আনিসুজ্জামানের মতে "আমি যতদূর জানি, এই সভাতেই সর্বপ্রথম–রবীন্দ্রনাথের নাম না করে – পূর্ব পাকিস্তানের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমী ও বেতারকেন্দ্রকে 'বিজাতীয় সংগীত-সাহিত্যের অভিশাপমুক্ত' করার অহবান জানানো হয়।" [আনিসুজ্জামান ২০০৩ : ৩৩৭]

রবীন্দ্র-বিরোধীদের এসব কথাবার্তায় কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে উৎসব উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে হাইকোর্টের বিচারপতি এস. এম মুরশেদ, বেগম সুফিয়া কামাল এবং প্রেসক্লাবের নেতৃত্বে তিনটি কমিটি গঠিত হয়।[২] ত্রয়ী কমিটি একত্র হয়ে ৪ দিনব্যাপী অর্থাৎ ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ বৈশাখ নানামুখী উৎসব আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল হাই, গোবিন্দচন্দ্র দেব, মুনীর চৌধুরী, খান সারওয়ার মুরশিদ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন। ২৪ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্যপাঠ এবং সংগীতানুষ্ঠান হয়। ২৫ বৈশাখ বিকেলে ফজলুল হক হলে আলোচনা সভা, সন্ধ্যায়

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্ররচিত দুটি নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চণ্ডালিকা' অভিনীত হয়।[৩] ২৬ বৈশাখ আলোচনা সভা এবং ২৭ বৈশাখ 'রাজা ও রাণী' চ্যারিটি শো (ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য) প্রদর্শিত হয়। এই কমিটি ১১ দিনের সার্বিক কর্মকাণ্ডে প্রায় আড়াইশ' রবীন্দ্রসংগীত ও ৪টি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে। সংগীত পরিবেশনে প্রায় শতজন শিল্পী এতে অংশগ্রহণ করেন,[৪] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, বিলকিস নাসির উদ্দিন, সন্‌জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, জাহানারা ইসলাম, বেলা রায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নাসরীন চৌধুরী, ভক্তিময় দাশগুপ্ত, ফজলে নিজামী, আতিকুল ইসলাম, ওয়াহিদুল হক, জাহেদুর রহিম প্রমুখ।

নৃত্যনাট্য পরিচালনায় ছিলেন মকসুদ উস সালেহীন ও বজলুল করিম। নৃত্য পরিচালক ছিলেন ভক্তিময় দাশগুপ্ত। অভিনেতা ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম, মাসুদ খান, দাউদ খান মজলিস, খোন্দকার রফিকুল হক, আনোয়ার হোসেন, রেশমা, কলিম শরাফী, হোসনে আরা লাইজু প্রমুখ। নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেন জিনাত গণি, মন্দিরা নন্দী, ফরিদা মজিদ, ফাহমিদা মজিদ, লায়লা নার্গিস, অজিত দে, জ্যাকব পিউরিফিকেশন, কামাল লোহানী, মৃন্ময় দাশগুপ্ত। নৃত্যনাট্যে গান গেয়েছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, ফজলে নিজামী, জাহেদুর রহিম, এনামুল হক, চৌধুরী আবদুর রহিম প্রমুখ।

সরকারি পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধকরণ

১৯৬১ সালের রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সম্প্রসারিত অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন, ১৯৬২ সালে ছাত্র-বিক্ষোভ এবং দুই বছরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় স্বাধিকার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। কিন্তু ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়, এরই মধ্যে রেডিও পাকিস্তান রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। অবশ্য ৪ মে আবার প্রচার শুরু করে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধিকার আন্দোলনের ঘোষণা দেন। ওই বছর ৯ মে 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী' নানা অস্থিতিশীলতার মধ্যে রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী পালন করে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে ঘোষণা দেন :

> বেতার ও টেলিভিশন থেকে পাকিস্তানবিরোধী রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের অন্য গানের প্রচারও হ্রাস করা হবে।[৫]

এই ঘোষণার প্রতিবাদে 'ক্রান্তি', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ', 'অপূর্ব সংসদ'সহ বিভিন্ন সংগঠন বিক্ষোভ করে। উনিশ জন কবি-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-শিল্পী-শিক্ষাবিদ একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন :

> ...এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করিয়াছে, তাঁহার সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানী সংস্কৃতির সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করিয়াছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময়ে এই সত্তার গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য। [মুরশিদ ১৯৮১ : ১৮৭]

পর্যায়ক্রমে প্রতিবাদ চলতে থাকে। বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে, 'ছায়ানট', 'আমরা ক'জন', 'শিল্পী ও সাহিত্য সঙ্ঘ', 'সংস্কৃতি সংসদ', 'ছাত্র ইউনিয়ন', 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী', 'স্পন্দন', 'আঞ্জুমানে আদব', 'ঐক্যতান', 'শান্তি পরিষদ', 'সৃজনী', 'বাংলা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ', 'বাণীচক্র', 'পুরবী' সংগঠন প্রতিবাদ জানায়। বেশ কয়েকজন উর্দু কবিও রবীন্দ্রচর্চার পক্ষে বিবৃতি প্রদান করেন। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ন্যাপ, আওয়ামী লীগ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়।

কয়েকমাস প্রতিবাদ-পাল্টা প্রতিবাদে মুখর থেকে ধীরে ধীরে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। ২২ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিবসে ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সমবেত গান পরিবেশিত হয়—'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে'।

১৯৬৭ সালের এই বিতর্কের ফলে রবীন্দ্রচর্চা আরো বিকশিত হতে থাকে এবং রবীন্দ্র দর্শনের উদ্ঘাটনসহ তাঁর সাহিত্যের স্বরূপ উন্মোচিত হতে শুরু করে। বিরোধিতাকারীরা ধীরে ধীরে নিশ্চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের আসন পাকা হয়ে ওঠে। এই সময় নানামুখি গবেষণা এবং বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গিয়েছে।

১৯৬৭ সালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো--রমনার বটমূলে প্রথম পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানের সূত্রপাত। দীর্ঘ ৫ দশক ধরে (১৯৭১ সাল ব্যতীত) এই অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা রবীন্দ্রসংগীতকে (অন্যান্য বাংলাগানের পাশাপাশি) জনপ্রিয় এবং অনন্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ' গান-এর মতো ঋতুভিত্তিক ও বিভিন্ন পর্যায়ের গান বাঙালি শ্রোতাদের অন্তঃকরণে পৌঁছে দেবার জন্য ছায়ানটের অবদান অনস্বীকার্য।

আন্দোলন ও সাংগঠনিক তৎপরতার জোয়ারে রবীন্দ্রনাথের যে সকল গান মানুষের মনে জাগরণ সৃষ্টি করেছিল, সেই গানসমূহের একটি তালিকা নিচে প্রদান করা হলো :

১. ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো॥
২. খর বায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
৩. হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ॥
৪. নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার—
জানি জানি তোর বন্ধনডোর ছিঁড়ে যাবে বারে-বার॥'
৫. ওরে, নতুন যুগের ভোরে
দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে॥
৬. ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্, লাগলো যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।

এমন বহু রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে মানুষের ভেতর প্রতিবাদ ও গণচেতনার উন্মেষ ঘটাবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রসংগীত

বাঙালির সংস্কৃতিচর্চায় রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া নিয়ে যে বারবার বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ হিসেবে পাকিস্তানি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও প্রধান সমস্যা ছিল ধর্মান্ধতা। আবার সংস্কৃতিকর্মীদের যে অশেষ রবীন্দ্রপ্রীতিই এই আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল, সে কথাও জোর গলায় বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ ভিতর থেকে জেগে উঠতে চাইছিল তাদের আত্ম-আবিষ্কারের তৃষ্ণায়। সেই প্রয়োজন একজন অসমর্থ মানুষের সমর্থবান হয়ে ওঠার জন্য আন্দোলনের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রত্যয় হিসেবে কাজ করেছিল। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সেই বিষয়টি ধরতে চেয়েছিলেন এভাবে যে :

> রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যে-ব্যক্তিকে তিনি শক্তসমর্থ মানুষ। আমাদের পঙ্গু ব্যক্তি রবীন্দ্রসংগীতে নিজেকে শনাক্ত করতে চায় শক্ত মানুষ হিসেবে। হয়তো এই দেখাটা ভুল কিন্তু এই ভুল দেখতে দেখতেই সে একদিন শক্ত একটি ব্যক্তিতে বিকশিত হতেও তো পারে। তখনই গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ববান মানুষ দায়িত্বশীল, সে কেবল নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকতে পারে না। তাই তার চারদিকের মানুষের প্রতি সে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে ওঠে। [ইলিয়াস ১৯৯৮ : ৮২]

সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধ ও পঙ্গুত্বের জীর্ণতা ভেঙে সমর্থ হয়ে ওঠার প্রত্যয় যখন সমষ্টিরূপ নেয়, তখন শত্রুর তাক করা বন্দুকের নল ভোতা হয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার এমন ঘটনা ঘটেছে। নিরস্ত্র-নিরীহ ও দাস মানুষেরা নিগৃহীতের শেষ পর্যায়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সেই ইতিহাসের সাথে রবীন্দ্রসংগীতের সম্পর্ক বাঙালির মানসচৈতন্যের সাথে এতদিনে যে গেঁথে গিয়েছে তারই নিদর্শন মুক্তিযুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ এখানেও সামর্থ্যের অনুপ্রেরণা।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রিটিশদের বিরোধিতা করার সময় বক্তারা যখন ইংরেজিতে বক্তৃতা দিত, তা দেখে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—

> কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে।
> কে বৃথা আশাভরে চাহিছে মুখ'পরে।
> সে যে আমার জননী রে॥
> কাহার সুধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর মানি।
> কাহার ভাষা হয়ে ভুলিতে সবে চায়।
> সে যে আমার জননীরে ॥

স্বাধিকার আন্দোলনের তুঙ্গাবস্থানে সেই স্নেহময়ী মায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এই গান গাওয়া হতো। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে আইয়ুব সরকারের পতনের কালে, পূর্বঘোষিত আদেশ থেকে সরে গিয়ে ঢাকার বেতার ও টেলিভিশন রবীন্দ্রসংগীতের সম্প্রচার বাড়িয়ে দেয়। ওই বছর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। ওই সময় তিনি রেসকোর্স ময়দানের এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দান করেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীতের প্রসঙ্গ। তিনি বলেন :

> আমরা মির্জা গালিব, সক্রেটিস, শেক্সপীয়র, এরিস্টোটল, দান্তে, লেনিন, মাওসেতুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখিয়া যিনি বিশ্বকবি হইয়াছেন। আমরা এই ব্যবস্থা মানি না—আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়িবই, আমরা রবীন্দ্রসংগীত গাইবই এবং রবীন্দ্রসংগীত এই দেশে গীত হইবেই।' [মুরশিদ ১৯৮১ : ২০৯; ইত্তেফাক : ২৪ ফেব্রু. ১৯৬৯]

এই বক্তব্য প্রদানের পর রেডিও-টেলিভিশনসহ নানা পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলায় শিল্পীদের গাওয়া গ্রামোফোন কোম্পানি কর্তৃক রবীন্দ্রসংগীতের একটি সেট উপহার প্রাপ্তি অনুষ্ঠানে বলেন :

> ...Tagore had reflected the hope and aspiration of the Bangalees through his works and without Tagore the Bengali language was incomplete. [মুরশিদ ১৯৮১ : ২০৯]

বিগত বছরগুলোতে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে টানাপড়েনের কারণে পক্ষান্তরে বাঙালির অস্তিত্বের মাঝে গভীর এক যোগসূত্র ও নিবিড় বন্ধন তৈরি হয়েছিল বলেই মুক্তিযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথের গান অফুরান প্রাণ-জাগরণের উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল। বিশেষ করে, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি সুরে-বেসুরে শিল্পী-কৃষক-তরুণ-যুবা-মুক্তিযোদ্ধা সবার কণ্ঠে অজস্রবার গীত হয়েছিল।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে বড় প্রেরণা ছিল গান। গোপনে বাংলা গানের বিচিত্র ধারা থেকে বাছাই করে, যা যুদ্ধের জন্য মনোবল জোগায় এবং চেতনার দৃঢ়তা আনে, সেই গানগুলো বিভিন্ন আসরে পরিবেশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের গানও শহীদ মিনার থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বাংকার পর্যন্ত গীত হয়ে ওঠে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গানগুলো হলো :

১. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়ব না মা!

২. আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু' বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥

৩. ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।

৪. ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

৫. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

৬. এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—

৭. নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়,
খুলে যাবে এই দ্বার—

৯. আজ আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও॥

১০. নব আনন্দে জাগো আজি নববিকিরণে
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে॥

১১. হে চিরনূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে॥

১২. সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ—
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত-পানে চাহো॥

১৩. শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান॥

১৪. ভাঙো, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
বন্দী প্রাণ মন হোক হোক উধাও॥

১৫. এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
'জয় মা' বলে ভাসা তরী॥

১৬. আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া,

১৭. নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।

১৮. আর নহে, আর নয়,
আমি করিনে আর ভয়।

১৯. এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ॥

২০. বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি
বারে বারে হেলিস নে ভাই!

২১. বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে॥

২২. যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না।
তবে তুই ফিরে যা-না।

২৩. ও রে আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারই জয় গাই।

২৪. ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি
এবার কঠিন হয়ে থাক না ওরে, বক্ষোদুয়ার আঁটি—

২৫. মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষা ঝুলি দেখতে পেলে॥

এসব গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একক ও সম্মেলকভাবে গাওয়া হতো। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে বিভিন্ন শিল্পীদের কণ্ঠে অধিকাংশ গানই গাওয়া হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে দেশাত্মবোধক গান, গণসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লোকসংগীত সব শ্রেণির গানই গাওয়া হতো। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীগান বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ছিল। এছাড়া শরণার্থী শিবিরে, মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন দলে, গেরিলা দলের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও দৃঢ়তার অস্ত্র হিসেবে উপর্যুক্ত গান অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। অস্ত্রের বদলে গান, নৈরাশ্য ও দিকভ্রষ্টতার মুহূর্তে কিংবা আত্মবিশ্বাসের সংকটে এই গান নির্ভয় সাহস জুগিয়েছিল। ওই সময়ের বাস্তবতা সম্পর্কে শিল্পী আবদুল আহাদ বলেন :

> স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীত আমাদের নানাভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলমন্ত্র ছিল একটি গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' [করুণাময় ১৯৮১ : ১৬৯]

এভাবে অনেক ত্যাগ-সংগ্রাম, আত্মাহুতি, প্রতিরোধ ও সাহসিকতার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আত্মীকরণ করে নিতে হয়েছে। বাঙালির এই আত্ম-আবিষ্কার রবীন্দ্র প্রতিভাকে আস্বাদনের চিরায়ত পরিবেশ দান করেছে।

সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই রবীন্দ্রনাথের গান বাংলাদেশের 'জাতীয় সংগীত' হিসেবে নির্বাচিত হয়। সন্‌জীদা খাতুনের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সংগীত হিসেবে বহু আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন। ২০১০ সালের সন্‌জীদা খাতুন তাঁর বাসায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন– বঙ্গবন্ধু আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন যে, 'আমার সোনার বাংলা' গানটিই স্বাধীন বাংলাদেশের 'জাতীয় সংগীত' হবে। ফলে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হলো 'আমার সোনার বাংলা'র সুর নিয়ে তখন নানা প্রশ্ন উঠলো। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে মাঠে ময়দানে আমরা নানা ভাবে নানা সুরে সাধারণ মানুষের মুখে গীত হতে দেখেছি, নিজেরা গেয়েছি, বঙ্গবন্ধু সেই সুরকেই অক্ষত রাখার পক্ষে মত দেন। কেবিনেট ডিভিশনের এক বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, 'আমার সোনার বাংলা' যে সুরে গেয়ে এই দেশকে স্বাধীন করা হয়েছে, সে সুরেই আমাদের 'জাতীয় সংগীত' গাওয়া হবে। এই সুরটি রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃত স্বরলিপি থেকে তো আলাদাই, এমনকি সুচিত্রা মিত্রের গ্রামোফোন রেকর্ড অনুসারে শান্তিদেব ঘোষের করা স্বরলিপি থেকেও খানিকটা সরে আসা সুর। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল থেকে এ পর্যন্ত সেই সুরেই গাওয়া হয়ে আসছে আমাদের 'জাতীয় সংগীত'। [আতিউর ২০০৯ : ১৭৩ ও সন্‌জীদা ২০০৮ : ১৩৯]

স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা এভাবে স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিকশিত হতে থাকে। ফলে তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের সকল দিক নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। অসংখ্য তরুণ শিক্ষার্থী শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। পরবর্তীকালে দেশে ফিরে প্রসিদ্ধ শিল্পী হিসেবে আসন পান কেউ কেউ। নানা ধরনের সংগঠন-সম্মিলন পরিষদ, সংগীত একাডেমির মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী রবীন্দ্রসংগীতের দ্রুত প্রসার ঘটে। রবীন্দ্রসংগীত বিশ্লেষণ নির্ভর গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। গড়ে ওঠে রবীন্দ্র সংগীত

বিষয়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। গানের প্রায়োগিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাত্ত্বিক ও সংগীতচিন্তার পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার চর্চাও কমবেশি শুরু হয়েছে। ফলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রসংগীত যথেষ্ট পরিমাণ ভূমিকা রাখতে পেরেছে বলেই বর্তমানে পরিশীলিত চর্চার ক্ষেত্র উন্মুক্ত রয়েছে।

টীকা

১ রাজনারায়ণ বসু তাঁর *আত্মচরিতের* ২০৮ পৃষ্ঠায় (১৯১২, ২য় সং) এই মেলা প্রসঙ্গে লিখেছেন, শ্রীযুক্তবাবু নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলার ভাব তাঁহার মনে উদিত হয়। [গীতা ১৯৮৩ : ৮]

২ অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মতেঃ '১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উদযাপনে বাধা এসেছিল সরকারী মহল থেকে। সেই প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে ঢাকায় প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মহল থেকে এবং পরে ওয়ারী অঞ্চল ও প্রেসক্লাব থেকে মোট তিনটি কমিটির মাধ্যমে একের পর এক অনেক দিন ধরে বিশ্বকবির জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়।' [মোতাহার ১৯৯১ : ১০২-১০৩]

৩ নৃত্যনাট্য বিষয়ে সন্‌জীদা খাতুন ভিন্নমত পোষণ করেন, তিনি বলেন— 'রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে বাফা-র (বুলবুল ললিতকলা একাডেমী) ভূমিকা ছিল বিশেষ প্রশংসনীয়। ভক্তিময় দাশগুপ্ত আর আতিকুল ইসলামের নেতৃত্বে 'শ্যামা' আর 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়েছিল।' [সন্‌জীদা খাতুন, ২০১১]

৪ ভিন্ন মতে 'এই এগারো দিনের উৎসবে তিনদিনের অনুষ্ঠান ছিল ঐ কমিটির নামে। বাকি আটদিন পূর্বাঞ্চল কমিটির। এতে গুণে গুণে একশ শিল্পী প্রায় তিনশ গান করেছিলেন।' [মোতাহার ১৯৯১ : ১০৪]

৫ সংবাদটি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে তৎকালীন দৈনিক সংবাদপত্র Pakistan Observer ২৩ জুন, এবং Morning News ও দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায়, ২৪ জুন ১৯৬৭ তারিখে।

গ্রন্থপঞ্জি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ১৯৯৮। *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

আতিউর রহমান, ২০০৯। *শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম*। ঢাকা : দীপ্তি প্রকাশনী।

আনিসুজ্জামান, ২০০৩। *কাল নিরবধি*। ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ।

আনিসুজ্জামান, ১৪১৭। *রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ* (প্রবন্ধ)। 'কালি ও কলম' (৭ম বর্ষ একাদশ সংখ্যা) (আবুল হাসনাত সম্পা.)। ঢাকা : আইস মিডিয়া লিমিটেড

করুণাময় গোস্বামী (সম্পা.), ২০০৫। *আবদুল আহাদ স্মারকগ্রন্থ*। ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী।

গীতা চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৩। *বাংলা স্বদেশী গান*। দিল্লী : দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।

গোলাম মুরশিদ, ১৯৮১। *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

সম্পাদকীয় ৮ই মে, ১৯৬১। *দৈনিক আজাদ*-এর প্রকাশিত সংবাদ। ঢাকা।

সম্পাদকীয় ১লা বৈশাখ, ১৩৬৮। *দৈনিক আজাদ*-এ প্রকাশিত *'রবীন্দ্রনাথ ও মাওলানা আজাদ'*। ঢাকা।

সংবাদ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯। *দৈনিক ইত্তেফাক*। ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৬৮। 'মরমী রবীন্দ্রনাথ' (প্রবন্ধ), *রবীন্দ্রনাথ* : আনিসুজ্জামান (সম্পা.)। ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ।

মোতাহার হোসেন সুফী (সম্পা.), ১৯৯১। *সিধুভাই : জীবন কথা* (প্রবন্ধ), সংস্কৃতি সংগ্রাম। ঢাকা : মোখলেসুর রহমান স্মৃতি সংসদ।

সন্‌জীদা খাতুন, ২০০৮। *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*। ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী।

সন্‌জীদা খাতুন, ২০১১। *মুক্তিসংগ্রাম, সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ* (প্রবন্ধ)। বাংলা একাডেমী একুশে গ্রন্থমেলার সেমিনারে ২ ফেব্রুয়ারি পঠিত।

সাইম রানা, ২০০৯। *বাংলাদেশের গণসংগীত : বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৫১। *পূর্বপাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা* (প্রবন্ধ), 'মাহেনও', আগস্ট সংখ্যা। ঢাকা।